তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য।

৹০০○০০৹-

ষষ্ঠ খণ্ড।

পঞ্চ 'ম'কার।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার এবং প্রকাশক—
শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু।
কলিকাতা—৪৪ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, শ্রীকৃষ্ণ প্রেস।

মূল্য ৶৹ আনা।

সন ১৩৩০ সাল।

তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য।

পঞ্চ "ম" কার।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত।

নিবেদন।

আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ে পাঁচ বৎসর কাল অপরিসীম পরিশ্রম করিয়া, অনেকগুলি তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ আলোড়ন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় এই "তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্যে" দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকৃত ও বিশদ অর্থ যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়াছি। ইহা পাঠে যদি সুধী ও সাধকবৃন্দের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার ও সাধনার সাহায্য হয় তবেই আমার এই ন্যূনসপ্ততি বর্ষ বয়সে বিপুল পরিশ্রম সার্থক হইবে।

এই ধর্ম্মগ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার খণ্ড বিভাগ করিয়া নিম্নে চুম্বক তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রথম খণ্ড—হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মকানন এবং তদন্তঃস্থিত বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, গীতা ও চণ্ডী, জ্যোতিষ, রামায়ণ, মহাভারত ও সংস্কারকগণ।

দ্বিতীয় খণ্ড—তন্ত্র, পঞ্চ উপাসনা, পঞ্চ দেবতা, দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা রহস্য।

তৃতীয় খণ্ড—ভাব, আচার ও মন্ত্র রহস্য।

চতুর্থ খণ্ড—যন্ত্র, মুদ্রা, ন্যাস ও উপচার রহস্য।

পঞ্চম খণ্ড—জপ, হোম, স্তুতি, পুরশ্চরণ ও ষট্‌চক্র ভেদ রহস্য।

খণ্ড—পঞ্চ 'ম'কার, ভৈরবী চক্র, লতা সাধন, শব সাধন ও শ্মশান সাধন ইত্যাদি রহস্য।

সপ্তম খণ্ড—নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া, ত্রিসন্ধ্যা, আচমন, অঘমর্ষণ, সন্ধ্যার ধ্যান, জপ সংখ্যা, নিত্যপূজা, নৈমিত্তিক পূজা, বলিদান, নীরাজন, বিসর্জ্জন, কাম্য কর্ম্ম ও পরিসমাপ্তি।

কিন্তু আমরা যে প্রথমেই ষষ্ঠ খণ্ড প্রকাশ করিলাম তাহার প্রধান কারণ এই যে তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'কার সম্বন্ধে অনেক ইংরাজী নবীশ নব্য কৃতবিদ্যগণ (ইহার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া) একটা বৃথা বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া থাকেন এবং বলেন 'সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রটা একটা কিম্ভূত কিমাকার ঘৃণ্য ব্যাপার; ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র নামেরও অযোগ্য। এই ভ্রান্তিপূর্ণ ভাব যাহাতে তাঁহাদের অন্তর হইতে একেবারে অপনোদন হয় তাহাই আমাদের চেষ্টা, উদ্যম ও উদ্দেশ্য। যখন ইহা বিচারপূর্ব্বক পাঠ করিয়া পঞ্চ 'ম'কারের গূঢ় অর্থ তাঁহাদিগের যথার্থ হৃদয়ঙ্গম ও মনঃপূত হইবে, তখন তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিষয়গুলির প্রকৃত মর্ম্ম জানিবার জন্য তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে স্বতঃই আগ্রহ হইবে। ইহার অন্যান্য খণ্ড পরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। এই সমগ্র "তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য" একটী বৃহদাকারের গ্রন্থে পরিণত হইবে।

কলিকাতা
৭৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
রাস পূর্ণিমা।
সন ১৩৩০ সাল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত।

তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য।

•০০০০০•

ষষ্ঠ খণ্ড।

প্রথম উল্লাস।

পঞ্চ 'ম'কার রহস্য।

তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'কার যেন সাধারণ ব্যক্তির চক্ষে তন্ত্রের কলঙ্ক স্বরূপ গৃহীত হয়। এই কারণে অনেকে নাসা কুঞ্চিত করিয়া তন্ত্রের নিন্দা করেন, এবং ইহাকে জঘন্য ও ঘৃণ্য ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন না। প্রশ্ন হইতেছে এই কদর্য্য পঞ্চ 'ম'কার ধর্ম্মগ্রন্থ তন্ত্রে সন্নিবেশিত হইল কেন? ইহা কি সত্য সত্যই তন্ত্রের দোষ, না কেবলমাত্র কতকগুলি অনভিজ্ঞ পাশবপ্রকৃতি গৈরিক বসনাবৃত ব্যক্তিগণের যথেচ্ছাচার আচরণের দোষ? তন্ত্রকর্ত্তা ত মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহাদেব। তাঁহার যোগের কি জ্ঞানের কি দৈব জ্ঞানের মধ্যে যে এ অব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইতে পারে ইহা ভাবিতেও যে মন বিচলিত ও সঙ্কোচিত হয়। তন্ত্রে

যে এরূপ বিধান দেখা যায়, তাহার কারণ তন্ত্রের অনেক শ্লোকই দ্ব্যর্থ বাচক ও দ্বিভাবাত্মক। সাধারণ লোক তাহার গূঢ়ার্থ না বুঝিয়া কেবল বাহ্যার্থ লইয়াই এইরূপ কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকে। আমরা এ বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আগমকর্ত্তা দেখিলেন ;--জগতে দুইটী পন্থা ; একটী নিবৃত্তি মার্গ ও অপরটী প্রবৃত্তি মার্গ। যাহারা নিবৃত্তি মার্গগামী তাঁহারাই ভোগ-বাসনা শূন্য নিস্পৃহ যোগী, আর যাহারা প্রবৃত্তি মার্গানুসারী তাঁহারা মায়া ও বিষয়াশক্তিপূর্ণ ভোগী। তন্ত্রশাস্ত্রে উভয় পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূখ্য ও চরম উদ্দেশ্য সাধকগণকে ভোগের পথ দিয়া ক্রমশঃ যোগের পথে পরিচালিত করা, অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তির পথে আনয়ন করা। ভগবান মনুও এই তত্ত্ব [illegible] যে মানবগণের আপাততঃ মনোরম মদ্য মাংস ও মৈথুনে অনিবার্য্য নৈসর্গিক আশক্তি ও প্রবৃত্তি আছে দেখিয়া তাহাতে বিশেষ দোষারোপ না করিয়া "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এই এক চরণে লোকের মন নরম করিয়া মতি গতি ফিরাইয়া ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রও সেইরূপ মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অধিকার ও ভাবভেদে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন; ইহাতে বুঝা যায় যে কুৎসিত অভিপ্রায় চরিতার্থ কামীগণের পক্ষেও তন্ত্রশাস্ত্র উপদেশ দিতে কৃপণ বা কুণ্ঠিত হয়েন নাই। বরং তন্ত্র শাস্ত্রোল্লিখিত নিয়মগুলি সম্যক প্রকারে পালন ও সাধন করিয়া যাহাতে অসদ্‌বৃত্তিগুলি ক্রমশঃ সদ্‌বৃত্তিতে পরিস্ফুট হয় তাহারই বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন।

"From evil cometh good".

অর্থাৎ অমঙ্গল হইতে যে মঙ্গলের উদ্ভব হয় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পুরাণে ও ইতিহাসে পাঠ করিয়াছি; পুরাণ ছাড়িয়া আমরা ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখাইব।

তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে অনেকে যে প্রথমে বাহ্যিক পঞ্চ 'ম'কার সাধন করতঃ শেষে মানসিক পঞ্চ 'ম'কারে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদের নামও অনেকে জানেন। যথা—আগমবাগীশ, পূর্ণানন্দ, রাজা রামকৃষ্ণ, ভক্ত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতি। আর দুর্দান্ত পাপাত্মারা যে পরে পরম ধার্ম্মিক হইয়াছিলেন তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বিল্বমঙ্গল ও জগাই মাধাই প্রভৃতি। এখন কথা হইতেছে যে এই সকল উচ্চকল্পের সাধকগুলি কি না বুঝিয়াই এই তান্ত্রিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং তাহাতে সকল মনোরথ বা সিদ্ধ হয়েন নাই? এ কথা কে অস্বীকার করিবে? আর তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণেতাগণ কি এতই ক্ষুদ্র ও অল্পবোদ্ধা ও অদূরদর্শী ছিলেন যে তাঁহারা পঞ্চ 'ম'কার সাধনার জঘন্যতা ও অপবিত্রতা আদৌ অনুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া তন্ত্রকে এত ঘৃণ্য করিয়া তুলিয়াছেন—এ কথাই বা স্বীকার করিতে পারে কে? তাঁহারা সাধনা সমুদ্রের অতল জলরাশির অন্তঃস্থলে ডুবুরির ন্যায় ডুব দিয়া জীবনপাত পরিশ্রম করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ইহার গভীর গর্ভমধ্যে অনেক পর্ব্বতমালা অনেক বৃহদাকার জলজন্তু অনেক মুক্তা প্রবালাদি রত্নরাজি স্তরে স্তরে স্থানে স্থানে বিরাজিত ও বিচরিতভাবে পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সাধনকামী ব্যক্তিগণের উপকার ও মঙ্গলার্থে, সমগ্র আগমশাস্ত্রে ইহা ভিন্নাধিকারীর জন্য ভিন্ন ভাবে রচিত ও বিহিত হইয়াছে। অল্প ধীসম্পন্ন ছিদ্রান্বেষী মানবগণ যাহারা কেবলমাত্র উপকূলে দণ্ডায়মান হইয়া এই তন্ত্র মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গনিক্ষিপ্ত বালুকানিশ্রিত কতকগুলি ক্ষুদ্র বরাটক ও শম্বুক দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে সমুদ্রের অন্তঃসার শূন্যতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের অসার ভ্রান্তিপূর্ণ প্রলাপ বাক্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আস্থা রাখিতে বা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবে? তাই বলি সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ কেবল পরের কথায়,

অগ্রে নিজের কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়া উড্ডীয়মান বায়সের পশ্চাৎ ধাবমান হইও না। নিজের বুদ্ধি খরচ কর তা'হলেই বুঝিবে—

"আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায় স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥"

এক্ষণে আমরা পঞ্চ 'ম'কারের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম, দেখা যাউক ইহা ত্যাজ্য কি পূজ্য।

তন্ত্রের পঞ্চ 'ম'কার পাঁচটী বিষয়ঃ—

যাহার প্রথম অক্ষর 'ম' যথা—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। আমরা দেখিতে পাই বৈদিক যুগে সুধা, মধু, সোমরস প্রভৃতি মাদক ও তেজস্কর পানীয় দ্রব্যের প্রচলন বিশেষরূপে ছিল এবং তাহা দেবতা ও ঋষিদিগের প্রিয় পেয় বস্তু ছিল। বৈদিক যুগের প্রায় সকল যজ্ঞেই মাংসের roast খাওয়া ব্যবস্থা ছিল যথা—অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতিতে। গোমাংস ভক্ষণ যে শীতপ্রধান ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে প্রচলিত ছিল তাহারও প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এক্ষণে যেমন আত্মীয় বন্ধু কুটুম্ব-দিগের সামাজিক ভোজের পরিতৃপ্তির জন্য ছাগমাংস ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়, সেইরূপ বৈদিক যুগে ঐসকল কারণে গোমাংসও ব্যবহৃত হইত। অভিধানে দেখা যায় অতিথির একটী নাম "গোঘ্ন"। বশিষ্ঠ ঋষি যে "বাছুরের মুড়া" খাইতে বিশেষ ভালবাসিতেন তাহা প্রাচীন গ্রন্থ উত্তররাম চরিতে পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা গেল যে তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব মদ্য মাংস বৈদিক যুগেও রীতিমত নির্দ্দোষ ভাবে প্রচলিত ছিল। আবার সংহিতা যুগেও ভগবান মনু বলিয়াছিলেনঃ—

"ন মাংস ভোজনে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মনুর সময় এ সামাজিক প্রবৃত্তি আপামর সাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল; কিন্তু ভগবান মনু ইহার শোচনীয় ফল অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া এই শ্লোকের শেষ চরণে কি সুন্দর "গায়ে হাত বুলান" কথা বলিয়া লোককে এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির মার্গে লইয়া গিয়াছিলেন; "নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" কথাটা অতুলনীয়; ইহা সকল বিষয়েই খাটে, ইহা অমূল্য, ইহাতে মনুর বিলক্ষণ বাহাদুরি আছে।

তাহার পর পুরাণেও দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণু ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ, বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং কুরুপাণ্ডব নৃপতিগণ ও বিরাট প্রভৃতি অন্যান্য রাজন্যগণ ও তাঁহাদের বংশীয়গণ প্রভৃতির মধু পানে মত্ততার (ঢলাঢলি মাতলামির) অনেক কথাই বর্ণিত আছে। যদুবংশ ধ্বংস ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এইরূপে যখন শ্রুতি সংহিতা পুরাণে তিন যুগ ধরিয়া পঞ্চ তত্ত্বের এত ছড়াছড়ি তবে এই কলিযুগে ইহার নিষেধ কেন? যাহারই নিষেধ আছে, বুঝিতে হইবে পূর্ব্বে তাহার বিধি ছিল, এইরূপ vice versa, তবে ইহাকে কলিযুগে এত ঘৃণা ভাবে গ্রহণ করা হয় কেন? এবং ইহার নিন্দা করিয়া কে প্রথমে বলিয়াছিল? কোন্ মহাপুরুষ ইহার প্রথম বিরোধী? ইহার উত্তর—শাক্য সিংহ! যিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা করিয়া ছিলেন, যিনি "অহিংসা পরমো ধর্ম্ম" এই স্বর্গীয় কথা মর্ত্তলোকে প্রথমে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যিনি রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণে হিংসার পৈশাচিক লীলা দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া কেবল পশু হিংসা নয়, মানব মাত্রেই যাহাতে পরস্পর হিংসা দ্বেষ না করে, তজ্জন্য দেশে দেশে সদুপদেশ বিলাইয়া ছিলেন। এমন দয়াল প্রভু আর কোথায় আছেন? যিনি সমগ্র জীবজন্তুর জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া মুক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন?

আমরা আরও দেখিতে পাই "মত্তমদেয় মপেয় মনিগ্রাহ্যং"। ইহা উসনার উক্তি; তিনি নিজে ভুক্তভোগী এবং পরে ইহার বীভৎস ফল দেখিয়া এইরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। ইংরাজীতেও একজন মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন:-

"Touch not, taste not, smell not anything that intoxicates the brain".

আবার দেখা যায় বহুকাল যাবৎ প্রচলিত দেশাচার মানবজাতির দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া উঠে যথা:-

'Nature is mother and habit is nurse".

সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—"ন দোবা মগধে মদ্যে" এবং "গৌড়ে মৎস্যস্থ ভোজনং"। ইহার বিধি নিষেধ পরস্পর বড়ই বিরোধী। কিন্তু আপামর সাধারণ সকলেই ইহা অসঙ্কোচিত ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন। তবেই দেখা যায় শাস্ত্র হইতে দেশাচার প্রবল, এবং সে দেশাচারও দূষণীয় নহে "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্য বিধীয়তে"। ইহাও শাস্ত্রের অভিমত।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে দূষণীয় ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ইহার বিশেষ নিষেধ আছে। বিশেষতঃ স্মৃতিতে মদ্যপায়ী ব্যক্তিকে অতিপাতকী বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে তাহার প্রায়শ্চিত্ত ভয়াবহ—একেবারে মৃত্যু। তত্রাচ তন্ত্রশাস্ত্র মতে ইহার ব্যবহার ধর্ম্ম্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে কেন? ইহা ত মূলতঃ স্মৃতির বিরোধী নয়। তন্ত্রশাস্ত্র সেই জন্য সুরার শাপ বিমোচন করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন। শাপ বিমোচনের প্রক্রিয়া কেবল দুই একটী মন্ত্র আবৃত্তি মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তন্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র। ইহার মন্ত্রের শক্তিতে সকলই হইতে পারে বুঝিতে হইবে। যখন শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র বলে

মৃন্ময় মূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, মৃত পিতামাতা পিণ্ড ভোজন করিয়া স্বর্গগত হয়েন, অসাধ্য রোগ মন্ত্রঃপূত প্রায়শ্চিত্তে দূরীভূত হয়, সমন্ত্রক বৈধ দানে গ্রহের কুদৃষ্টি শুভ দৃষ্টিতে পরিণত হয়, মৃত ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পুষ্করা দোষ খণ্ডিত হয় তখন সামান্য জলীয় মদ্য যে মন্ত্রবলে অমৃতে পরিণত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি? এইরূপ বিশ্বাসে আস্থা রাখিয়াই পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছে।

তন্ত্রের মধ্যে একটী শ্লোক যাহা আছে এবং মদ্যসেবী সাধকগণ যাহার উপর নির্ভর করিয়া স্বপক্ষ বলবৎ করেন সে নজীরটীর শ্লোক এইরূপ :—

"পীত্বা পীত্বা পুনঃপীত্বা পীত্বা পততি ভূতলে।
উত্থায় চ পুনঃপীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"

শ্লোকের রচনা প্রাঞ্জল, অর্থও দুরূহ নহে, রস লালাস্রাবী, সুতরাং আর ব্যাখ্যার আবশ্যক নাই! কিন্তু এই কি ধর্ম্মশাস্ত্রের উক্তি? আমরা দেখিয়াছি তন্ত্রের অনেক শ্লোক দ্ব্যর্থ বোধক ambiguous, এমন শ্লোক আছে যাহার ভাষা অতীব অশ্লীল এমন কি পাঠ করিতে ইচ্ছা পর্য্যন্ত হয় না, অথচ ইহার শেষ চরণে ফল শ্রুতি "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" কিন্তু সেই শ্লোকগুলির ভিতরে যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা অতীব মনোহর ও ভক্তিপূর্ণ। উপরোক্ত শ্লোকটী তাহার মধ্যে অন্যতম। এক্ষণে ইহার গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে; এই শ্লোকে "পীত্বা" শব্দটী পাঁচবার ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু "কিং পীত্বা" তাহা আদৌ লিখিত নাই। তবে "পততি ভূতলে" বলিয়া যে "মদ্য"কেই কর্দ্দমপঙ্ক ঠেলে উহ্য করিতে হইবে তাহারই বা অর্থ কি? অবশ্য মাতাল কসমের লোক এইরূপ অর্থ ধরিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং ধূলিতেও লুণ্ঠিত হইবে, তাহা বলিয়া সকলে সে কথা স্বীকার করিবেই বা কেন এবং

উহা ধর্ম্ম্য বলিয়া মানিবেই বা কেন? ইহার প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ এই: "যখন সাধক খেচরী মুদ্রায় প্রতিনিয়ত অভ্যস্থ হইয়া আপনার জিহ্বা উল্টাইয়া তালুমূলের নীচে দিয়া ক্রমশঃ গলার নলির মধ্যে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হয়েন তখন ক্রম অভ্যাসে তাঁহার খেচরী মুদ্রা সাধিত হয়। সেই ক্রিয়ার নিত্যচর্চ্চা অন্ততঃ ক্রমশঃ এক ঘণ্টা কাল একাগ্র চিত্তে অভ্যাস করিতে করিতে সহস্রার হইতে যে অমৃত রস ক্ষরণ হয় তাহা পান করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতে থাকে এবং অন্তরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূতি হয়, ইহা যোগীগণ ও সাধকগণ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সেই সঞ্জিবনী সুধারস পান করাই এই শ্লোকের একমাত্র অর্থ। ইহা বারম্বার পান করা উচিত এবং অধিক পানে সাধক ব্রহ্মভাবে আত্মহারা হইয়া জ্ঞানশূন্য বা সমাধিগ্রস্ত হনেন, অতঃপর পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আবার ঐ সুধাপানে নিয়ত রত থাকেন তাহা হইলে আর তাঁহাকে বার বার সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ মুক্তি হয়, মুক্তি জ্ঞান ব্যতীত হয় না, সেই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, উহা ষট্চক্র সাধনারই ফল। এই শ্লোক সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীগণের জন্য রচিত হইয়াছিল। গৃহী তান্ত্রিকগণ ইহার বিপর্য্যয় অর্থ করিয়া নিজেরা "মদের পীপার" স্বরূপ হইয়া পড়েন।

আগমশাস্ত্রের আবার শ্লোকান্তরেও দেখা যায়, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন;---

"সোমধারাক্ষরেৎ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

অর্থাৎ (ষটচক্রভেদ অভ্যস্ত হইলে ও ষড়রিপু দমিত হইলে) ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয় তাহা পান করিয়া যিনি আনন্দ অনুভূত করেন তিনিই প্রকৃত মদ্যসাধক।

সত্য বটে ভৈরবী চক্রে মন্ত্রের সাধনার জন্য মদ্যের ব্যবহার তৎকালিক আছে তাহা অল্প মাত্রায়, ঢলাঢলির মত নহে। মাতলামি করা তন্ত্রের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। তাই মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন ;—

"নৃণাং স্বভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন মৈথুনং।
সংক্ষেপায় হিতার্থায় শৈবধর্ম্মে নিরূপিতং॥"

আরও বলিয়াছেন ;—

"মন্ত্রার্থ স্ফুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ।
সেব্যতে মধু মাংসাদি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী॥"

আমরা এইরূপে আরও বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ তত্ত্ব তান্ত্রিকের অন্যবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রমাণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে সদাশিব আদ্যা কালিকাকে বলিতেছেন :—

"আদ্যতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে।
অপস্তৃতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে।
পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে॥"

অর্থাৎ—

আদ্য তত্ত্ব—মদ্য = তেজ,
দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস = পবন,
তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য = অপ,
চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা = পৃথিবী,
পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন = আকাশ।

এই পঞ্চ মহাভূতাত্মক পবিত্র পঞ্চ তত্ত্ব হায় হায় কি অপবিত্র ভাবেই না পরিণত হইয়াছে?

বৈষ্ণব তন্ত্রের পঞ্চ তত্ত্ব কি তাহাও এখানে বর্ণিত হইতেছে ঃ—

"গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে॥"

এই সুন্দর পঞ্চ তত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কত উচ্চ আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতদেবও এই প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিময়ী গীতাবলিতেও দেখা যায় যে তিনি ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তির প্রকৃত উপাসক ছিলেন কিন্তু পঞ্চ "ম"কারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না বা তাহাতে তাঁহার আসক্তি বা অনুরক্তি ছিল না। এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত থাকিতেও যে আধুনিক মদ্যপ শঠ লম্পট সাধকগণ তন্ত্রের দোহাই দিয়া নিজেদের জীবনযাত্রা ও চরিত্র কেন কলুষিত করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সনাতন-ধর্ম্ম-গঠিত-সুসংস্কৃত সমাজ ইচ্ছা করেন যেন তাহাদিগের ছায়া খর্ব্বীকৃত হউক।

জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মহা শাক্ত ছিলেন এবং প্রকৃত কৌল ছিলেন। ত্রিপুরাসুন্দরী মহাবিদ্যা তাঁহার আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা ছিলেন, এখনও তাঁহার আরাধিত ত্রিপুরা যন্ত্র বিদ্যমান আছে; চৈতন্যদেবের সমস্ত লক্ষণও কৌলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত; অর্থাৎ শাক্ত ভাব গোপন রাখিয়া জনসাধারণকে বৈষ্ণব মতের শিক্ষা দিতেন। তন্ত্রোক্ত কৌলের লক্ষণ এইরূপ ঃ—

"অন্তঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ।
নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥"

তন্ত্রশাস্ত্রেও আদেশ আছে ধর্ম্মচর্চ্চা গোপন করিবে যথা :-

"প্রকাশে কার্য্যহানিস্যাৎ গোপনে সিদ্ধিরুত্তমা।"

সাধারণতঃ দেখা যায় সকল গভীর বিষয়ে মন্ত্রণা গোপনে করিতে হয়, তাহা প্রকাশ হইলে কার্য্যে সিদ্ধি লাভ হয় না। কি সাংসারিক কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্ব্বত্রই এক নিয়ম।

তাই বোধ হয় মহাপুরুষদিগের ধর্ম্মচর্চ্চা গূঢ় ভাবে সাধিত হইত। তাই বোধ হয় মহাত্মারা বলিয়া থাকেন---"Do as I say but not as I do"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেন :-

"মাগুর মাছের ঝোল,
ভর যুবতীর কোল,
বোল হরিবোল।"

নব বৈষ্ণব ধর্ম্মের অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষের এবম্বিধ উক্তি শুনিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন; কিন্তু তাঁহার এ উক্তিটির অর্থান্তর অতীব মনোহর।

'মাগুর মাছের ঝোল' অর্থে আঁখির লোর, 'ভর যুবতী' অর্থে বসুন্ধরা।

এক্ষণে ইহার ভাবার্থ,—ভক্ত হরিধ্বনি করিতে করিতে যখন ভাবে গদ গদ হয়েন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু দরদরিত ধারায় বিগলিত হয় এবং পরে ক্রমশঃ ভগবদ্‌ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত অবস্থাতেও শ্রীহরির সুমধুর নাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন বা দশাপ্রাপ্ত হয়েন তখনি তাঁহার ভক্তির উৎকর্ষতা প্রকটিত হয়।

ঐতিহাসিক যুগের আদর্শ ভক্তাবতারের ইহাই ভক্তির চরম উপদেশ ও চরম পরীক্ষা।

এক্ষণে আমরা পঞ্চ 'ম'কারের প্রত্যেকটীর নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথম তত্ত্ব—মদ্য।

মদ্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া স্থির করিয়াছি যে সামান্য মদ্য পান করা তন্ত্রের প্রকৃত গূঢ় উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে ভগবৎ ভাবের মত্ততা আইসে তাহাই মদ্য, সে মদ্য পূর্ব্বেই বলিয়াছি—খেচরী মুদ্রা সাধনা। তাহাতে মত্ততা যত পরিমাণে আনে বোতল বোতল মদ খাইলেও তাহার শতাংশের একাংশও হয় না। আবার কেহ কেহ ঐরূপ মত্ততা বা ভরপুর নেশা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মদ্যের বিনিময়ে সাদরে সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্ত্রও তাহা বলিয়াছেন, "সম্বিদাসবয়োর্মধ্যে সম্বিদেব গরীয়সী।" তাই অনেকে মদ ছাড়িয়া সিদ্ধি প্রচুর পরিমাণে পান করে।

এক্ষণে আমরা তন্ত্রের "সম্বিদ্ আসব" সম্বন্ধে শ্লোকার্দ্ধের অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।

সম্বিদ্ (সং+বিদ্ ধাতু+ঘঙ্) অর্থাৎ সম্যক প্রকার জ্ঞান; এবং আসব (আং+সু ধাতু+অ) প্রসব অর্থে; অর্থাৎ এই জড় দেহ হইতে যে শক্তি বা মায়া উৎপন্ন হয়। ইহা বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিপাদ্য মৎপ্রণীত "মা" পুস্তকে লিখিত আছে;—"জড় যথা শক্তি তথা" আসব কিনা মদ্য যেমন মনুষ্যকে নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইরূপ মায়াও সংসারের জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে। কিন্তু সংবিদ অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান এবং সিদ্ধি—

বিজয়াও বুঝায়; বিজয়া কিনা মায়া জয় করা শক্তি। সুতরাং সম্বিদাবস্থাতে আর মায়ায় মোহাচ্ছন্ন থাকে না, একেবারে মুক্ত ভাবাপন্ন হয়, তাহাই সাধনার সিদ্ধ ফল। সুতরাং সম্বিদই (জ্ঞানই) আসব (মায়া) হইতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; সেই জন্যই বোধ হয় মহাজ্ঞানী মহাদেবকে 'সিদ্ধিখোর' বা 'ভাঙ্গড় ভোলা' সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্লোকেও দেখা গেল অনেকগুলি তন্ত্র মদ্যের পক্ষপাতী নহে এবং অনেকগুলি প্রকারান্তরে তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়াছেন এবং যেগুলি পশুভাবের তন্ত্র তাহারা ত বিশেষ বিরোধী। তবে বীরভাবে যে মদ্য ব্যবহার আছে তাহা নির্ভীক হইবার জন্য তাহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস।

মাংস অর্থে জিহ্বা, কারণ জিহ্বা অস্থিহীন একখণ্ড মাংস যাহা মুখবিবরে থাকিয়া রস আস্বাদন করে এবং শব্দাদি ধ্বনিত করে। সাধকের ভগবৎ স্তুতি বা গান গাহিবার কালীন ভক্তিরসে গদ গদ ভাবে গলিত নেত্রে ও অর্দ্ধস্ফুটিত স্বরে যখন বাক্যগুলি জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে তখনই প্রকৃত মাংস সাধন হয় এবং তাহাই ধর্ম্ম্য বলিয়া গৃহীত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রে লেখা আছে,—

> "মা শব্দাদ্রসনাজ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।
> সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধকঃ॥"

অর্থাৎ মা শব্দে রসনা বুঝায়, রসনার অংশ যে বাক্য তাহা রসনার বড় প্রিয় বস্তু, যে ব্যক্তি উহা ভক্ষণ করিতে পারে, কিনা বাক্য সংযম করিতে পারে সেই প্রকৃত মাংস সাধক।

তন্ত্রশাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

"গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমর বারুণীং।
তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ॥"

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ এবং অমর বারুণী সুধা পান করেন, তাহাকেই কুলীন বলিয়া জানি ইতরে কুলনাশক। হঠ-প্রদীপিকার এই শ্লোক কি ভয়ানক কথাই বলে শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়; কিন্তু এই দ্ব্যর্থ বাচক শ্লোকের অর্থ অতি নিগূঢ় ও সুন্দর। গো শব্দে জিহ্বা, সেই জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করণের নাম গোমাংস ভক্ষণ। জিহ্বাকে সদাসর্ব্বদা এইরূপ রাখিতে অভ্যাস করিলে জিহ্বার সংযম হয়, জিহ্বার সংযম হইলে বাক্য সংযম হয়। ইহাই প্রকৃত মাংস সাধনা। ইহা রীতি মত অভ্যস্ত হইলে তালুমূলস্থ চন্দ্রের ক্ষরিত সুধামৃত সাধক পান করিয়া থাকেন। ইহাও ষট্‌চক্র সাধন সাপেক্ষ। এইরূপ প্রকরণেই মাংস সাধন তন্ত্রের গূঢ় অভিমত।

অবোধ প্রাণির প্রাণ সংহার করিয়া তাহার মাংস সুন্দররূপে রন্ধন করিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিলে যে ঈশ্বর সাধন হয় ইহা ঔদরিক ও মাংস লোলুপ জীব ব্যতীত কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে; হইতে পারে ধর্ম্মের সহিত আহারের কোন সংস্রব নাই, কিন্তু দেহের সহিত স্বাস্থ্যের সহিত রুচির সহিত অভ্যাসের সহিত সংস্কারের সহিত ও সমাজের সহিত বিলক্ষণ বাধ্য বাধকতা আছে; ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া যে এতগুলি উপরোধ অনুরোধ এড়াইয়া স্বার্থ সাধন করে সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দাস ও স্বার্থপরবশ। এই প্রবৃত্তিই আত্মদ্রোহী ও পরদ্রোহী তবে তাহাদের এ ধর্ম্মের ভান কেন? ইহা পশুভাবে একেবারে নিষিদ্ধ তবে বীর ভাবের সাধনায় ব্যবস্থিত হইয়া থাকে তাহা দৈহিক বল আহরণ জন্য। কারণ দুর্ব্বলের বীরত্ব অসম্ভব।

তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য।

মৎস্য অর্থে চক্ষু। আমরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের "মাগুর মাছের ঝোল" উক্তিটী অর্থ করিবার সময় বুঝাইয়াছি এক্ষণে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর প্রণিধান হয় না, ভক্তিস্রোত যখন উথলিয়া উঠিয়া চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় প্রেমবারি নিঃসরণ হইতে থাকে তখন যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা কি সামান্য মাংসের ঝালে ঝোলে ভাজায় উপলব্ধি হয়? ধর্ম্ম বাহিরের ক্ষণিক সুখের জন্য নয়, উহা অন্তরের নিত্য আনন্দের জন্য। আবার দেখ মৎস্য জাতীয় জীব নির্নিমেষ। তাহার জন্য বলিয়াছেন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থির দৃষ্টি নিমেষ শূন্য ভাবে অধিকক্ষণ রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করাই মৎস্য তত্ত্ব সাধন।

তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন,—

"গঙ্গাযমুনয়োর্ম্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতে সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্‌যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

গঙ্গা ও যমুনা কিনা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয় মধ্যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ দুইটী মৎস্য বিচরণ করিতেছে তাহাদিগকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযম করিয়া প্রাণকে স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করার নামই মৎস্য ভক্ষণ—ইহাই প্রকৃত মৎস্য সাধন। মৎস্য মাংস ভোজন—সুতরাং ধর্ম্ম নহে। শ্রুতি বলেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।" নীতিশাস্ত্রও বলেন সর্ব্ব জীবে দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। তাই তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

"দয়া ধরম্‌কি মূল হ্যায় নরক মূল অভিমান।
তুলসী কহে দয়া না ছোড়ে যবতক্‌ ঘটমে প্রাণ॥"

চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা।

তান্ত্রিকগণ মুদ্রাকে ভর্জ্জিত চণকাদি বলিয়া ব্যবহার করেন, যথা বাদাম ভাজা ছোলা ভাজা চানাচুড় প্রভৃতি মদের চাট শ্রেণী। বাহ্যিক ধর্ম্মধ্বজী বীর সাধকগণের পক্ষে এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ধর্ম্ম রক্ষক বীরগণ জানেন যে তাঁহাদের হৃদয়রূপ কোষ (খোসা) মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি চণকবৎ বিহার করিতেছেন, তাহাই দেহের ইন্দ্রিয়রূপ ইন্ধনে প্রজ্জলিত পাপানল বাশির দ্বারা অনুক্ষণ ভর্জ্জিত হইতেছে। এইরূপে ভর্জ্জিত অবস্থাই হউক বা অভর্জ্জিত অবস্থাই হউক সেই চণকবৎ প্রকৃতি পুরুষের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ (manifestation) প্রতিনিয়ত আলোচনা করিয়া chew, chew, chew and digest এই মুদ্রাতত্ত্ব সাধনের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং॥
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্র কোটা সুশীতলং।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং।
যস্যজ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥"

ইহার ভাবার্থ,—মস্তিস্কে যে পারদ সদৃশ আত্মা বিরাজমান তাঁহাকে যিনি কুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত ভাবিয়া চিন্তা করেন তিনিই যথার্থ মুদ্রা-সাধক। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই প্রাণবায়ুরূপে শরীরাভ্যন্তরে বিরাজমানা। রুদ্রযামল বলেন "সা দেবী বায়বী শক্তিঃ।"

অপিচ আমরা দেখিয়াছি যে কুলকুণ্ডলিনী সাধনার সময় শরীরে নানাবিধ কম্পন ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত ধ্বনি ও আঁখি হইতে অনর্গল অশ্রুপাত স্বতঃই পতিত হইতে থাকে—তাহাই মুদ্রা। যেমন গায়ক ও যন্ত্রবাদকদিগের মধ্যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী ও শরীর 'নাড়াচাড়া' দেখিলে তাহার মুদ্রাদোষ বলা যায়; সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী বা ষট্‌চক্র সাধনার সময় যে সমস্ত মুদ্রা দৃষ্ট হয় তাহা অর্বাচীনগণের "mystical gesticulations" নহে; তাহা তন্ত্রের মুদ্রাতত্ত্ব। এইজন্য সাধকগণ এ সমস্ত সাধনা নির্জ্জনে করিয়া থাকেন, কারণ 'গোলা' লোক ইহা দেখিলে মনে করে সাধক নিশ্চয়ই পাগল কিম্বা মৃগীরোগগ্রস্থ। তন্ত্রের সাধনা সেইজন্য নিভৃতে ও নির্জ্জনে করাই ব্যবস্থা—বাহ্যাড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। যোগ সাধনায়ও নানা প্রকার মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয় - সেটা গৃহী অপেক্ষা সন্ন্যাসীর বিশেষ সাধনীয়, সুতরাং এখানে বলা হইল না।

পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন।

স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধই মৈথুন—ইহা ব্যতীত আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা রুচিবিরুদ্ধ এবং অশ্লীল, সুতরাং অলমতি বিস্তরেণ। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে যখন অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠাই জীবের জন্মের প্রধান কারণ তখন জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য এ সম্বন্ধে এত বৃথা লজ্জার ভান (prudery) প্রকাশ করেন কেন? একজন আধুনিক দার্শনিক বলেন:—

"We should not be ashamed to name which God has not been ashamed to create."

এই জ্ঞান প্রাচীন আর্য্যজাতির অন্তরে বহুকাল জাগরূক ছিল। এসিয়া ও যুরোপ খণ্ডের প্রাচীন কবিদিগের রচনায় তাহার যথেষ্ট

প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত আরব্য ও পারস্য ভাষার প্রাচীন কবিগণ Ovid's 'Art of love' কে টেক্কা দিয়াছেন। Shakespere, Byron কোথায় লাগে। অপরন্তু ভারতের অনেক হিন্দু মন্দিরে ঐ ভাবের প্রস্তর খোদিত আলেখ্যগুলি এখনও জাজ্জ্বল্যমান, পুরীর মন্দির গাত্র তাহার প্রকট দৃষ্টান্ত। হিন্দু জানিতেন জগতের জীবকুল এই আদি রসে নিয়তই ডুবু ডুবু ও মজ্জমান, আর অন্তর্জ্জগতে অর্থাৎ হৃদয় মন্দিরের অভ্যন্তরে অভীষ্ট দেবতার প্রতিকৃতি স্বতঃই দেদীপ্যমান। তন্ত্রশাস্ত্রেও বলেন ;—"মূলাধারে বসেৎ শক্তিঃ সহস্রারে সদাশিবঃ।" এই উভয় দেবতার মিলনের নামই মৈথুন। অপিচ এইরূপও বলিতেছি যে তন্ত্রশাস্ত্র যখন পঞ্চম তত্ত্বকে আকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অন্যান্য চারিটী মহাভূত এই আকাশেই লীন হয়, সেইজন্য আকাশের সহিত ভূতগণের মিলনই এই মৈথুন তত্ত্ব। অথবা জীব মাত্রেই প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষের মিলনই মৈথুন। যেরণ্ড সংহিতা বলেন ;—

> "যোনিমুদ্রাং সমাসাদ্য স্বয়ং শক্তিময়োভবেৎ।
> সুশৃঙ্গার রসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি॥"

অর্থাৎ সাধক যোনিমুদ্রা অবলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকৃতিরূপিণী শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপ শিব চিন্তা করিবে তাহাতে প্রকৃতি পুরুষ বা শিব শক্তি জ্ঞান হইবে। তখন স্ত্রীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার সম্পূর্ণ সামরস বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণ চিন্তাই মৈথুন সাধন তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি হয়। তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেন ;—

> "মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥"

ইহার সাধন প্রক্রিয়া,—মনকে নাভিপদ্মে স্থির করতঃ শ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে যোজনা বা মিলন করার নাম মৈথুন। এইরূপ করিলে জীবের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে;—ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে!

আবার গোরক্ষসংহিতায়ও দেখা যায়;—

"শক্তিময়ঃ স্বয়ং ভূত্বা পরঃশিবেন সঙ্গমম্।
নানাসুখং বিহারঞ্চ চিন্তয়েৎ পরমং সুখং॥"
শিব-শক্তি-সমাযোগাদেকান্তং ভুবি ভাবয়েৎ।
আনন্দশ্চ স্বয়ং ভূত্বা অহং ব্রহ্মেতি সম্ভবেৎ॥"

তন্ত্রশাস্ত্র আবার বলিয়াছেন;—

"কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্তিতম্॥"

ইহাও ষট্চক্রভেদের কথা!

তবেই দেখা গেল যে পঞ্চ 'ম'কার একটা ঘৃণার বস্তু নহে, ইহার গভীর ভাব বড়ই গূঢ় ও রহস্য পূর্ণ। অর্ব্বাচীন তান্ত্রিকগণ ইহার নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া সকল কর্ম্মই পণ্ড করে এবং ধর্ম্মের অপব্যবহার করে, আর সগর্ব্বে বলেন "আমরা অভিষিক্ত"। তবেই 'কেল্লা ফত্তে' করিলেন আর কি?

দ্বিতীয়োল্লাস

ভৈরবী চক্র।

পশু ভাবাপন্ন সাধকগণের পক্ষে তন্ত্রশাস্ত্র পঞ্চ 'ম'কার ব্যবহার একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। তবে বীরভাবে ইহার ব্যবস্থা বিধিমত লিখিয়াছেন। তাহাতেই অভিষিক্ত বীরগণ ইহার অসৎ ব্যবহার 'ফ্যাসোয়া' করিয়া চালাইয়া থাকেন। এক্ষণে অভিষেক কাহাকে বলে বুঝা যাউক।

আধুনিক অভিষেক আমেরিকার ফিলেডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব. বঙ্গের নবদ্বীপাদি টোলের উপাধির ন্যায় ফুরাণ চুক্তিমত পয়সা দিলেই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত অভিষেক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের ন্যায় বড়ই বাধা ধরা। ইহাতে "হাড় ভাঙ্গা" পরিশ্রম চাই তবে পাশ হওয়া যায়। দীক্ষা গ্রহণ যেন Matriculation পাশ করা, শাক্তাভিষেকটী যেন Intermediate Examination (সাবেক F. A, বা L, A,) পূর্ণাভিষেক যেন B, A, বা B, Sc, Grade; ক্রমদীক্ষা যেন M, A, বা M, Sc, তাহার পর সাম্রাজ্য দীক্ষা Raichand Premchand Studentship; ইহার কোনটীই খরিদ করা যায় না। অন্য প্রকার অভিষেকগুলি যেন Law Medicine ও [illegible] বিদ্যার সমান ধরিতে হইবে। সেইরূপ গুরু যখন বুঝিবেন যে শিষ্য ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তখন তাহাকে একটীর পর আর একটী করিয়া তাহার সাধনা ও চর্চার অনুযায়ী ক্রমোন্নতি দেখিয়া বা পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রঃপূত বারি দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন অর্থাৎ পাপের

উপাধি দিবেন। শিষ্য পয়সা দিতে সমর্থ হইলেই যে গুরুঠাকুর ঝড়াঝড় তাঁহাকে একে একে সকল অভিষেকগুলি পাশ করিয়া দিবেন এবং নিজের থলি ভারি করিবেন, সেটা শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। অভিষেকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে এইরূপ বুঝাইয়া এক্ষণে ভৈরবী চক্রের কথা বলিব।

ভৈরবী চক্র তন্ত্রের আবিষ্কৃত বস্তু। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা ও রুচি। প্রথমতঃ অবশ্য স্থানে স্থানে বিকীর্ণ ভাবে হইয়া থাকে। কেননা তন্ত্র বলেন ঃ—

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।
স্ত্রীবাথ পুরুষ ষণ্ড শ্চাণ্ডালো বা দ্বিজাতয়ঃ।
চক্রমধ্যে ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বে দেবসমাঃ প্রিয়ে।
নগরী নির্ঝরাদ্যম্বু গঙ্গা প্রাপ্য যথৈকতাং।
শান্তি শ্রীচক্রমধ্যেতু চৈকত্বং মানবাঃ স্মৃতাঃ।
ক্ষীরেণ সহিতং তোয়ং ক্ষীরমেব যথাভবেৎ।
তথা শ্রীচক্রমধ্যেতু জাতিভেদো ন বিদ্যতে।

তবেই এইরূপে ভৈরবী চক্রের দোহাই দিয়া যদি চাতুর্ব্বর্ণের স্ত্রীপুরুষের বসা পান আহার একত্রে চলে, এবং ইহা যদি সর্ব্বদা অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে আর কাহারই জাত্যভিমান বড় একটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই রহিবে না। ক্রমে জাতিভেদ ভাবটা অন্তর হইতে তিরোহিত হইবে, কেহ কাহাকে ঘৃণা করিবে না এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যেও লজ্জা ও ভয় অপসারিত হইবে। তাই বীরগণ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকৃতে নয়।"

এইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে ভৈরবী চক্র সাধিত হইলে নরনারী মধ্যে অনেক ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে; সেটা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না হইলেও স্বভাবতঃ উহার ব্যত্যয় দেখা যায়। এমন কি গুরুর সহিত শিষ্যার এবং গুরু পত্নী বা গুরু কন্যার সহিত শিষ্যেরও অবৈধ সংঘটনের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। ভৈরবী চক্রে অনেক ইন্দ্র-অহল্যা চন্দ্র-তারা এবং Abelard Eloisaর কথা এখনও শোনা যায়। যে জাত্যভিমান ও জাতি বিভিন্নতা ভারতবর্ষের সামাজিক প্রথার প্রধান উপাদান তাহা এই ভৈরবী চক্রে দৃষ্ট হয় না। তাহার আর একটা প্রমাণ ভৈরবী নির্ব্বাচনে দেখা যায়ঃ-- ভৈরবী চক্র সাধারণ নাম বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ নাম পঞ্চ চক্র। সেই পঞ্চ চক্র যথাঃ—

১। রাজ চক্র

২। মহা চক্র

৩। দেব চক্র

৪। বীর চক্র

৫। পশু চক্র

এই পঞ্চ চক্র সাধন কালে পঞ্চ কামিনীর উপস্থিতি আবশ্যক। সেই পঞ্চ কামিনী হইতেছেন :—

১। মাতা (বিমাতা)

২। ভগিনী

৩। দুহিতা

৪। স্নুষা

৫। গুরু পত্নী (বা স্বপত্নী)

এই পঞ্চ চক্রে ক্রিয়া কলাপ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন থাকিলেও মোটের উপর একই প্রকার। সে যাহা হউক তন্ত্রশাস্ত্র ঐ পঞ্চ কামিনীর জাতি নির্ব্বাচন করিয়া কিরূপ সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন দেখা যাউক ঃ—

"ভূমীন্দ্র কন্যকা মাতা, দুহিতা রজকী স্মৃতা।
শ্বপচীচ স্বসা জ্ঞেয়া, কাপালী চ স্নুষা স্মৃতা।
যোগিনী নিজশক্তিঃ স্যাৎ, পঞ্চ কন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"

এই শ্লোকে বিশেষ উপলব্ধি হয় যে ব্রাহ্মণ সাধকগণ চক্রে এই সমস্ত নীচ জাতীয়া কন্যার সহিত স্বচ্ছন্দে পান আহার বিহার করিতে পারেন ঃ আরও দেখা যায় রেবতী তন্ত্রে ঃ—

"কন্যকাঃ পরমেশানি বিদগ্ধাঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
নটী কাপালিকী বেশ্যা মালিনী কঙ্কমালিনী ॥
চণ্ডালী চ কুলালা চ রজকী নাপিতাঙ্গনা।
গোপিনী যোগিনী শুদ্রা ব্রাহ্মণী রাজকন্যকা ॥
কোচাঙ্গনা চ দেবেশি তথৈব শঙ্খকারিণী।
এতাঃ ষড়্‌বিংশতিঃ কন্যা দেবানামপি দুর্লভাঃ ॥
দৈবজ্ঞাঃ ব্যাধলোমা চ তথা মাংসাপহারিণী।
বৌদ্ধা চ জননী দেবি তথা রজপসারিণী ॥"

আবার এক স্থানে দেখা যায় ;—
"নটীং কাপালিকাং বেশ্যাং খণ্ডিতপাণীং ব্রাহ্মণীং।
শূদ্রাণীং ম্লেচ্ছরমণীং জম্বকীং পরমেশ্বরি ॥"

ইহাতে একেবারে "একচ্ছত্রী" ব্যাপার, আর কিছুই বাদ পড়িল না।

স্মৃতির পাতিত্য, প্রায়শ্চিত্ত, অব্যবহার্য্যত্ব, অপাঙ্‌ক্তেয়ত্ব প্রভৃতি দণ্ডবিধির শাসন বচনগুলি একেবারে উল্টে গেল; আর অপর জাতির অন্ন ভক্ষণ ও স্ত্রীগমন জনিত দোষে কাহারই জাতঃপাত হইতে হইল না; স্মৃতির উপর তন্ত্রের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। তন্ত্রের ইহাই যেন জবরদস্ত প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। শুধু তন্ত্র কেন ভারতবর্ষে যে সমস্ত উচ্চ কল্পের বা মধ্যম কল্পের সংস্কারকগণ অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া। তন্ত্রও তাহা করিয়াছেন। তবে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণের মন আকর্ষণ করিবার জন্য বোধ হয় এই কৌশল প্রথমে গৃহীত ও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্মের ভান করিয়া নানা মন্ত্রের ব্যবহার করিয়া শুদ্ধি সাধন করিয়া প্রথমে নির্জ্জনে অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া মাথার দিব্য দেওয়া হইয়াছে "গোপয়েৎ মাতৃজারবৎ।" ইহা ব্যতীত সাধারণ নিয়ম ত আছেই;—

"প্রকাশে কার্য্যহানিস্যাৎ গোপনে সিদ্ধিরুত্তমা।"

ভৈরবী প্রভৃতি চক্রের অনুষ্ঠান করিতে হইলে একজন পূর্ণাভিষিক্ত কৌল ইহার চক্রাধীশ্বর হইয়া থাকেন। কারণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে,—

"পূর্ণাভিষেকাৎ কৌলঃ স্যাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চ্চকঃ।"

তিনি ব্রাহ্মণেতর জাতি হইলেও কুলধর্ম্ম আশ্রিত বশতঃ সকলেরই পূজ্য হবেন।

সাধকগণ ক্রমশঃ ইহাতে বারম্বার অভ্যস্ত হইলে ঘৃণা লজ্জা ভয় স্বতঃই তিরোহিত হইবার সম্ভব। তন্ত্রশাস্ত্র বার বার প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বীরভাব ও দিব্য ভাবের সাধকগণ ইহাতে অষ্ট পাশ

হইতে মুক্তি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না একেবারে নির্ব্বাণ হয়। সংসারের অষ্টপাশ এই ঃ—

"ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পাশ বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ॥"

আর কুলার্ণব তন্ত্রের "আনন্দ স্তোত্র" পাঠ করিলে এবং উহার আনন্দোল্লাস দেখিলে সকলেরই মন বিচলিত হয়, সকলেই এই পথের পথিক হইতে চায়।

এই প্রকার কামাগ্নি সন্দীপনীয় বিলাসপূর্ণ প্রহেলিকায় প্রলোভিত ও প্রণোদিত হইয়া নরনারীর মন স্বভাবতঃ নিশ্চয়ই বিচলিত হইবার কথা, সুতরাং তাঁহারা এই পঞ্চ 'ম'কার সমন্বিত ভৈরবী চক্রের পর্ব্বে পর্ব্বে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার নিগূঢ় রহস্য কি তাহা না বুঝিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি যথেষ্ট আস্থা রাখিয়া যেন নব প্রসূত বায়স শিশুর বস্তু বিশেষের আস্বাদন করার মত পাশবিক সুখ লাভার্থে এই চর্চ্চা করিয়া থাকেন সেইটাই বড় দুঃখের বিষয়। অথচ নিরুত্তর তন্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে ;—

"অঙ্গং নৈব স্পৃশেত্তাসাং স্পৃশেচ্চ নরকং ব্রজেৎ।"

চক্রে নরনারী পর্য্যায়ক্রমে একটার পর আর একটী (circle) চক্রাকারে বসিয়া আপন আপন চিত্ত সংযম করিয়া যদি কোন একটী মাত্র বিষয় লইয়া স্থির ভাবে চিন্তা করেন এবং তাহাতে সকলে ঐ চিন্তায় নিবিষ্ট চিত্তে যোগদান করেন, তাহা হইলে স্ত্রী ও পুরুষগণের একাগ্রীভূত (concentrated) চিন্তাস্রোত (positive ও negative magnetism) আকর্ষণী শক্তির সহায়ে উভয়রূপে একত্রে সঞ্চালিত হইয়া

প্রত্যেকের মনের তাড়িৎ শক্তি ক্রম অভ্যাসে বিশেষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলে এবং যিনি চক্রেশ্বর না (medium) হয়েন তাঁহার (clairvoyanco) শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া অনেক ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা বলিতে পারেন। এই চক্রানুষ্ঠানের অনুকরণে আজ পাশ্চাত্য সভ্য জাতি বিজ্ঞানপূর্ণ কত (spiritualism) প্রেততত্ত্ব সভা, কত clairvoyance ক্রিয়া, কত (mental magnetism) [illegible] এবং (psycopathy) আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতির জন্য প্রধাবিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সাধকগণ যে বৈজ্ঞানিক বলে উহা সম্পাদিত করিতেছেন কত কাল পূর্ব্বে তাহা ভারতের শাস্ত্রকারগণ তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন ভাবিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। আদিম ভারতের আদিমত্ব সকল বিষয়েই প্রকটিত দেখা যায়, অধুনা তাহা পাশ্চাত্য দেশে নূতন পরিচ্ছদে প্রকাশমান। আমরা ইহার প্রকৃত রহস্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেবল বাহ্যাড়ম্বরের অপলাপে সমস্তই পণ্ড করিয়া থাকি।

তৃতীয়োল্লাস।

লতা সাধন।

পুরুষ যেমন তরুর উপমেয়, লতাও সেইরূপ স্ত্রীজাতির। সুতরাং 'লতা' শব্দে স্ত্রী বুঝায়। সেই স্ত্রী লইয়া সাধন করাকেই লতা সাধন বলে। ভৈরবী চক্রে যেমন পাঁচটী ভৈরব (বীর সাধক) পাঁচটী কামিনীর সহিত জাতিভেদ বর্জ্জন করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন, লতা সাধনে সেরূপ নহে ইহাতে একটী মাত্র বীর একটী শক্তি লইয়া পঞ্চ

'ম'কার সাধন করেন। মোট কথায় ইহা ভৈরবী চক্রের 'সংক্ষিপ্তসার' ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই শক্তিটী স্বশক্তি হওয়াই উচিত, অভাবে পরাশক্তির ব্যবস্থাও আছে। ক্রিয়া প্রণালী একরূপই অনেকটা বটে, তবে নির্জ্জনে বসিয়া সাধনার জন্য আর একটু রঙ চড়ানো ও ফলানো আছে। এইরূপ ভাবে প্রবৃত্তি মার্গে সাধনা করিয়া সাধক আপনাকে বীরশ্রেষ্ঠ মনে করেন অথচ প্রকৃত সাধনার কিছুই হয় না; positive ও negative magnetism যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তাহার কোন ক্রিয়া হয় না, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা। তাই তন্ত্রসার বলেন ;—

"লিঙ্গযোনিরতো মন্ত্রী রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।"

এবং কবি তুলসী দাসও সেই কথা চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া বলিয়াছেন ;—

"দিনকা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লহু চুষে।
সারা দুনিয়া, বাউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পুষে॥"

ধর্মের নামে এ বাঘিনী পোষার ফল,—নিজের চরিত্র নাশ। সে যাহা হউক স্বকীয় স্ত্রীর সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে একমনে সমস্ত বিষয়েই ধর্ম্ম ভাব প্রয়োগ করিতে হয় তবেই সংসার সুখময় হয় এবং পরস্পরের দেহ ও মন এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাস্তবিকই স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী হন। আর পরাশক্তি -সেটা বিধবা হওয়া চাই এবং সাধকও বিপত্নীক হইবেন। এই উভয়ে মিলিয়া যেরূপ সাধনা তাহা সমাজ বিগর্হিত ও নিন্দার্হ বটে, কিন্তু দুর্দ্দমনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অপ্রতিহত শাসনে কালে প্রচার হেতু উহা মার্জ্জনীয় দোষ (pardonable faults) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব তন্ত্রের "সেবা দাসী" গ্রহণ পূর্ব্বক জপাদি সাধনও এই শাক্তগণের লতা সাধন প্রণালীর অনুকরণ; বৈষ্ণব মতে তাহাও

দোষাবহ নহে। বক-মার্জ্জার-ধর্ম্মী অপবিত্র গর্ভজাত গৃহস্থ সংসারী-গণের স্বগৃহে গুপ্ত প্রণয় বা অজোবৃত্তি অবলম্বন অপেক্ষা ইহা লক্ষগুণে মার্জ্জনীয়। সে যাহা হউক তন্ত্রশাস্ত্র কলিযুগের ধর্ম্ম, কিন্তু চারি যুগের ধর্ম্মনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপক ভগবান মনু মনুষ্যের হিতকল্পে যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলেরই শিরোধার্য্য ও পালনীয়।

"প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।"

তন্ত্রশাস্ত্রও সেই কথা বলেন ;—

"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীব সংস্থিতৌ।
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি॥"

"ইতি শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী।"

পূর্ব্বে বলিয়াছি সাধকের সাধনায় প্রবৃত্তিমার্গ উদ্বোধন করিবার জন্যই এই পঞ্চ তত্ত্বের প্রলোভন সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু সাধক যখন ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইয়া ইহার কদর্য্য পাশবিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ হয়েন তখন ইহার অনুকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন, যথা—দধি, আদা গুড় লবণ নারিকেল জল তাম্রপাত্র কাংস্যপাত্র ইত্যাদি। তন্ত্রেও তাহা বলিয়াছেন ;—

"অভাবে সর্ব্ব দ্রব্যাণামনুকল্প কলৌ যুগে।
অথবা পরমেশানি মানসং [illegible]।

স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ প্রিয়ং।
মানসং মদ্য মাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ॥"
সর্ব্বন্তু মানসং কুর্য্যাত্তেন সিদ্ধতি সাধকঃ।

ইহাতে বুঝা গেল পঞ্চ তত্ত্বেরও মানসিক ব্যবস্থা আছে, পূর্ব্বেও দেখাইয়াছি যে অধিকার ভেদে সকল বাহ্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবস্থিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের সকল শাখাতেই ইহা দেখা যায়। জানিনা কত দিনে এই তন্ত্রের মানসিক ক্রিয়া ও সাধনা সাধকগণের চিত্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে? তখন নরনারীর হৃদয় প্রকৃতই দেব মন্দির হইবে। আর এক কথা,—পরাশক্তি অর্থে বৈষ্ণবগণের 'মাতাজী' বা শাক্তদিগের 'ভৈরবী' নহে। মূলাধারস্থা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী তাঁহাকেই সহস্রারে ব্রহ্মরূপী সদাশিবের সহিত মিলন করান। এই প্রকৃত অর্থ।

কুল সাধন।

অতঃপর 'কুল সাধন' সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। সকল তন্ত্রেই যে কুল সাধন প্রসঙ্গ আছে তাহা নহে। পশুভাবের সাধকদিগের জন্য ইহা একেবারেই নিষিদ্ধ হয় নাই, তবে বীর ভাবের ও কৌল ভাবের সাধক-দিগের জন্য গুপ্ত সাধন তন্ত্র, রেবতী তন্ত্র, শক্তিকাগম সর্ব্বস্ব, নিগম কল্পদ্রুম, যোনি তন্ত্র, উত্তর তন্ত্র, সময়াচার তন্ত্র, নিরুত্তর তন্ত্র এবং বৃহন্নীল তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে কুল সাধনের প্রয়োগ প্রণালী বিলক্ষণ দেখা যায়,—এবং ঐ তন্ত্রগুলিতে পঞ্চ 'ম'কারের মধ্যে বিশেষতঃ প্রথম ও শেষ 'ম'কার সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা অতীব অশ্লীল ও জঘন্য। তাহা আবৃত্তি বা অর্থ করা নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ। কিন্তু অন্যান্য প্রামাণ্য ও প্রাচীন মৌলিক তন্ত্রে উহার কোন কথাই নাই। সে যাহা হউক সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রকে "শিব বাক্য" বলিয়া যদি বুঝিতে হয়, তবে যখন দিগম্বর মহাদেব অর্দ্ধনগ্না কোচরমণীদিগের সহিত 'কুচনী পাড়ায়' মধুর ভাবে লীলা করিয়াছিলেন—ইহা সেই সব প্রসঙ্গের

উদ্দেশেই লিখিত হইয়া থাকিবে—এইরূপ অনুমান হয়। অধিকন্তু ইহাতে প্রকারান্তরে এই শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে আজন্ম সাত্ত্বিকাচারী যোগলিপ্সু মনুষ্যগণ যদি কখনো কামাদির প্রলোভনে পড়িয়া যোগভ্রষ্ট হয়েন তবে তাঁহাকে পুনরায় তামসিক ভোগাভিলাষী সংসারী হইতে হয়। স্বয়ং মহাদেবকেও এই হইতে হইয়াছিল, তিনি মহাযোগী হইয়াও আবার দার পরিগ্রহ করিয়া মহামায়া উমার সহিত সংসারী হইয়াছিলেন। শেষ কথা, আমরা বিশেষ অনুধাবন করিয়া "কুল সাধনের" অনেকগুলি দ্ব্যর্থ বাচক শ্লোকের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক অর্থে যাহা যৎকিঞ্চিৎ বুঝিয়াছি তাহা রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম ;—কিন্তু উহার নিগূঢ়ার্থ ভাবসুধাপানোন্মত্ত শিবশক্তি সংযোগ-- সুতরাং অতীব মনোহর। ফলতঃ যাঁহারা ইহার সার মর্ম্ম প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন তাঁহারাই তন্ত্রের নিন্দা করেন,—যাঁহারা বুঝেন তাঁহারা করেন না। তাই কবি তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

> "গুণ ছোড়কে দোষ যা তায়ে যেতনি খললোক।
> ক্ষীর ছোড়কে রুধির পীয়ে যব পয়োধর লাগে জোঁক॥"

চতুর্থোল্লাস।

শব সাধন ও শ্মশান সাধন ইত্যাদি।

শব সাধন, শ্মশান সাধন ও যোনি সাধন এই তিনটীর প্রক্রিয়া যাহা তন্ত্রে লেখা আছে তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে এই সাধনা ত্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য "ঘৃণা, লজ্জা, ভয়" যাহা মনঃসংযোগের নিতান্ত অন্তরায় তাহা ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া একাগ্র মনে তন্ময় চিত্তে ইষ্টদেবতার জপ ও ধ্যান করা। ঘৃণা ত্যাগ করিয়া শবকে উপুড় করিয়া শোয়াইয়া তাহার উপর বসিয়া জপ করা। এই রূপ অভ্যাসে ঘৃণা বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল অন্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও জপ করিয়া মনের প্রফুল্লতা বর্দ্ধন করিতে হয়। শ্মশান বড় ভয়াবহ স্থান বিশেষ নিশীথ সময় তথায় বসিয়া নির্ভীক হইয়া একাগ্রমনে নাসাদির ক্রিয়া পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত ভাবে যে ধ্যান জপাদি করা হয় তাহাই শ্মশান সাধন। ইহা ভয় অপনোদনের প্রধান পন্থা।

যোনি সাধন—কামিনীকে নির্জ্জনে লইয়া লজ্জা ও কামনা শূন্য হইয়া যে সাধনা তাহাই যোনি সাধন ইহাই লজ্জা নিবৃত্তির উপায়। এই সাধনাগুলির আনুষঙ্গিক ক্রিয়া অনেক প্রকার আছে ও পূজা প্রকরণও যথেষ্ট আছে। ইহা নির্ভীক বীর সাধকগণের দ্বারাই সাধিত হয়, সুতরাং পঞ্চ তত্ত্বের মধ্যে আবশ্যক মত দুই একটা বা সকল তত্ত্বেরও ব্যবহার আছে, যাহাতে শরীর ও মনকে দৃঢ় ও উত্তেজিত করে। ইহার সবিশেষ বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া ইহার গূঢ় উদ্দেশ্যের সারাংশ সংক্ষেপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব।

শব সাধনে বুঝিতে হইবে যে আদ্যাশক্তি (primal force) শব

অর্থাৎ জড়ের উপরেই উপবিষ্টা আছেন, তাই তিনি শববাহনা। এই আদ্যাশক্তি (electricity) বা জীবনীশক্তির অভাবে দেহ নির্জীব হইয়া শবে পরিণত হয়। এই শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব কি প্রকারে সংঘটন হইয়া থাকে সেই বিষয় চিন্তা করা এবং মৃত্যুর পর জীবের পরিণতি কোথায় তাহারও চিন্তা করা প্রকৃত শব সাধন। এই চিন্তার ধারাবাহিক স্রোতে জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গভীর ও গূঢ় কথার অনুশীলন ও আবিষ্কার হইয়া থাকে। এই ত গেল দর্শন সম্বন্ধে আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার গবেষণা করিতে হইলে শারীর বিদ্যা ব্যবচ্ছেদ রীতিমত শিক্ষা করা আবশ্যক, ইহা বৈজ্ঞানিক শব সাধনা। কারণ তন্ত্রশাস্ত্র সম্পূর্ণই শারীরিক যন্ত্রতন্ত্রের ও মানসিক তত্ত্বের আকর। তাহার আলোচনাই তন্ত্রশাস্ত্র সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্মশান সাধন অর্থে বুঝিতে হইবে—

"শবানাং শয়নং ইতি শ্মশানং।"

শ্মশান ভূমি জীবের শয়ন বা শেষ পরিণতির স্থান। জীবের জীবদ্দশায় যত কিছু জারি জুরি, যত কিছু ইচ্ছা উদ্যম ও ক্রিয়া, যত কিছু "হাম বড়া" বা আত্মম্ভরীতা; যত কিছু ন্যায় অন্যায় আচরণ, যত কিছু হিতাহিত ব্যবহার তাহা কিছুদিনের জন্য হইয়া থাকে, অবশেষে এই মৃত্যুই তাহার পরিণাম। সুতরাং "পরিণাম বাদ" ইহার অভ্যন্তরে বীজ স্বরূপ নিহিত আছে। সাধক এই সমস্ত জীব-চরিত্র-তত্ত্ব অভিজ্ঞ হইবার জন্য নিভৃত চিন্তা করিতে করিতে আত্মসংযমী হয়েন ও সাবধানে আত্মোন্নতি সাধন করিয়া শ্মশানবাসী শিব সদৃশ হয়েন। ইহার প্রকৃত প্রক্রিয়া ভূতশুদ্ধি। ষটচক্রজ্ঞান ব্যতীত ভূতশুদ্ধি হইতেই পারে না, তবে যে পূজা কালীন ব্রাহ্মণগণ "বামে উত্তানৌ করৌ কৃত্বা হংস ইতি" ইত্যাদি অনর্থক আবৃত্তি করিয়া থাকেন তাহা কিছুই নহে সেটা এক

রকম "প্রেতশুদ্ধি" বলিলেও চলে। ধ্যান ও ভূতশুদ্ধি আবৃত্তির বস্তু নহে, ইহাতে গভীর চিন্তা চাই; বিশেষ অভ্যাস চাই; মনের একাগ্রতা চাই; কেবল মাত্র পুঁথি দেখিয়া আবৃত্তিতে যে কার্য্য সিদ্ধি হয় সেটা সম্পূর্ণ ভুল, "বোকা বুঝানো কথা" ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যোনি সাধন—প্রণালী যাহা সাধকগণ করিয়া থাকেন তাহা একেবারে অকথ্য। তবে আমরা বুঝি যে শ্মশান সাধন যেমন জীব-শক্তির সমাপ্তি কল্পে, সেইরূপ যোনি সাধনও জীবশক্তির আরম্ভ কল্পে। যোনি জীবের উৎপত্তির স্থান। কিরূপ ভাবে জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সেই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান করাই প্রকৃত সাধনা। জীব চেতন ও উদ্ভিদ্ দুই প্রকার আছে। ইহা ব্যতীত ধাতু মণি মুক্তা প্রবালাদিও আছে, ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ প্রকারের উৎপত্তির কারণ বিশেষরূপে নির্ণয় করা ও তাহার গূঢ় গবেষণা করাই প্রকৃত সাধনার উদ্দেশ্য। এইরূপ সাধনায় যাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা অতীব আবশ্যকীয়। তাহাতে যে সাধক যতটা গূঢ় রহস্য নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন তিনি তত পরিমাণেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবেন এবং তিনিই প্রকৃত যোনিতত্ত্ব সাধক। তিনিই বিজ্ঞান রাজ্যের প্রকৃত বীর। প্রকৃত যোনি সাধনের দার্শনিক নামান্তর—"আরম্ভ বাদ"।

তৎপরে আরও অন্য প্রকার সাধনাও আছে। যথা, ক্রিয়া সাধন:— ইহা পশু ভাবের সাধকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া করিতে করিতে তাহাতে যে একটা ধর্ম্মভাবের ধারাবাহিক আসক্তি জন্মায় তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত হয়। তাই তন্ত্র বলেন:—

"কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যাজ্ঞানমুপালভেৎ।
জ্ঞানান্মুক্তির্মহাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে॥"

সেই ভক্তি সাধনা কি পশু কি বীর উভয়েরই সাধ্য বস্তু। অবশ্য বীরগণের "ভক্তি সাধনে" ক্রিয়া সাধন অনেক খর্ব্বীকৃত হয় ও রূপ পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু ভক্তি অচলা থাকে। দিব্য ভাবে বাহ্যিক ক্রিয়া প্রায়ই ক্রমশঃ লোপ হয় এবং জ্ঞানের সহিত মানসিক ক্রিয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধন হয় এবং ভক্তির পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং সেই জ্ঞান দ্বারাই "ব্রহ্ম সাধনা" সাধিত হয়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলেন ;—

"বিহায় নামরূপানি নিত্যে ব্রহ্মণি নিশ্চলে।
পরিনিশ্চিত তত্ত্বো যঃ স মুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
ন মুক্তির্জ্জপনাদ্ধোমাৎ উপবাস শতৈরপি।
ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞাত্বা মুক্তো ভবতি দেহভৃৎ॥"

* * * *

"মনসা কল্পিতা মূর্ত্তির্নৃণাংচেন্মোক্ষসাধনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥"

* * * *

"বায়ুপর্ণকণা তোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষি জলেচরাঃ॥"

তাই ব্রহ্ম সাধনায় জাতিভেদ থাকে না, বিধি নিষেধ থাকে না। তখন জপ নাই, হোম নাই, উপবাস নাই, মনঃকল্পিত মূর্ত্তির আরাধনা নাই, কঠোর কষ্টসহিষ্ণু ব্রতের আবশ্যক নাই। উচ্চ কল্পের তন্ত্রসাধক-দিগের পক্ষে এই বিধি ঠিক বেদান্ত বা উপনিষদাদি গ্রন্থের উপদেশের ন্যায় তন্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন। তাহাতেই সাধকগণের দিব্যজ্ঞানের

উদয় হয়, তখন বাহ্য পদার্থে ও পরব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা সকলই অপসারিত হয়; থাকে কেবল সত্যনিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও পরোপকারিতা। ইহাই প্রকৃত কৌলের দিব্য ভাব। এই ধারণাগুলি "বিবর্ত্ত বাদের" প্রতিকৃতি। তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হয় সুতরাং অনাবশ্যক বোধে তাহা আর উল্লেখ করা গেল না। তন্ত্রের এই সমস্ত দেখিলে কি আর তন্ত্রশাস্ত্রকে জঘন্য বলা যাইতে পারে? ব্রিটিশযুগের বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথমে এই তান্ত্রিক ব্রহ্ম সাধন ক্রিয়ার সূত্রাবলম্বনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থাপনকর্ত্তা একজন প্রকৃত কৌল ছিলেন এবং তিনি একজন খ্যাতনামা কৌল গুরুর শিষ্য।

আর এক কথা। পূর্ব্বোক্ত সাধনাগুলির স্থান নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তন্ত্র বলেন, নিজ গৃহে, বিল্বমূলে, গোষ্ঠে, উদ্যানে, শিবালয়ে, গুরু সান্নিধ্যে, পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থস্থানে, শ্মশানে, বনে, গুহায়, পর্ব্বত মস্তকে, নদীকূলে, নদী সঙ্গমে, সমুদ্রকূলে ও চতুষ্পথে ইত্যাদি।

"অথবা নিবসেত্তত্র যত্র চিত্তং প্রসীদতে।"

তন্ত্রলিখিত এই স্থানগুলি মোটামুটি ভাবে ইহার নির্জ্জনতা আমরা বুঝিয়াছি, কিন্তু "চতুষ্পথে" যে সাধনা কিরূপে হইবে তাহা বুঝা যায় না। চতুষ্পথ অর্থে বুঝা যায় রাস্তার চৌমাথা;—সেখানে নির্জ্জনতা কোথায়? লোক সমাগম ত হইয়াই থাকে। নির্জ্জন না হইলে নির্ব্বিঘ্নে ও নিবিষ্ট-চিত্তে সাধন করা সম্ভবপর নহে। তবে বোধ হয় চতুষ্পথের অর্থান্তর আছে। আমরা উহা যেরূপ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি তাহাই বুঝাইতেছি।

আমাদের দেহটী স্কন্দ স্বরূপ এবং হস্ত ও পদ এই চারিটী তাহার শাখা স্বরূপ, এই চারিটী শাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেহটীকে চতুষ্পথের মধ্যস্থান বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং এই দেহের মধ্যে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ষট্‌চক্রভেদ করার নিত্য অভ্যাসই প্রকৃত চতুষ্পথে সাধন করা হয়। অথবা সনাতন ধর্ম্মের শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র এই চারিটী মার্গই চতুষ্পথ। এই চতুর্ম্মার্গের সাধনা ক্রমশঃ সাধিত হইলেও ভাল হয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে অর্থ করিলে আমরা অন্যান্য সকল স্থানগুলিই নিম্নলিখিত ভাবে বুঝিতে পারি; নিজ গৃহে অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তরে; বিল্বমূলে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মূল মূলাধারে অথবা স্বাধিষ্ঠানে; গোষ্ঠে কিনা গোমাতা বা পৃথ্বীমাতার ক্ষিতিতত্ত্ব স্থান—মূলাধারে; উদ্যানে আনন্দপ্রদ হৃদয়ে,—কিনা অনাহতে;—শিবালয়ে—সর্ব্বমঙ্গলালয় সহস্রারে; গুরুসন্নিধানে অর্থাৎ গুরুস্থান,—আজ্ঞাচক্রে; পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান মেরুদণ্ডস্থিত সকল ষট্‌চক্র স্থানে; শ্মশানে অর্থাৎ মৃত্যুকালীন যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া রোদন করে সেই স্থানে—বিশুদ্ধাখ্যে; বনে—উন্মত্ত মাতঙ্গের আবাস ভূমি, দুর্দ্দমনীয় স্বাধিষ্ঠানে; গুহায়—হৃদয়কন্দর অনাহতে; পর্ব্বত মস্তকে শীর্ষস্থ সহস্রারে; নদীকূলে চিত্রা নাড়ীর কূলে; নদীসঙ্গমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গমস্থলে; সমুদ্রকূলে অর্থাৎ যেখানে সকল নদীর (নাড়ীর) লয় স্থান কিনা (নাভিপদ্মে)—মণিপুরে; এই সমস্ত স্থলগুলিতে ক্রমশঃ একটী একটী করিয়া স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে মনের স্থির আসন পাতিয়া নিত্য ধ্যানের অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলেই চিত্ত নিরোধ হইবে ও কার্য্য নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। ষট্‌চক্র সাধনে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চ মুণ্ডের আসন;—সাধনার অন্যতম প্রধান আসন। ইহার

প্রকৃত অর্থ হস্ত পদ উদর শিশ্ন ও জিহ্বা—এই পাঁচটীকে আত্মবশে আনিয়া তাহার উপর মনের আসন পাতিয়া বুদ্ধি বা জ্ঞানের চর্চ্চা বা সাধন করাই কর্ত্তব্য। কেবল নিরহ পাঁচটী জীবের মস্তক কাটিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া তাহা আসনে পরিণত করায় কোন ফল নাই।

আমরা ষট্‌চক্রে ভৈরবী চক্রে শব সাধনা ও শ্মশান সাধনা প্রভৃতিতে যে সাধন ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি সে সমস্তই জপ সাধন প্রকরণের প্রণালী। প্রণালী মানসিক জপ, অর্থাৎ বীজ মন্ত্রটীকে মাতৃকা বর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া অনুলোম বিলোমে জপ করিতে হয়। যথা,—অং (মূল) অং, আং (মূল) আং, ইং (মূল) ইং, ইত্যাদি। এই জন্যই তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্নসংশয়ঃ।"

বীর সাধকগণ তন্ত্রের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া ঐসমস্ত উপায়ে জপ সাধন করিয়া থাকেন। কারণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে,—

"পুরশ্চর্য্যাশতেনাপি শবমুণ্ড চিতাসনাৎ।
চক্রমধ্যে সকৃজ্জপ্ত্বা তৎফলং লভতে সুধীঃ॥"

কথাটী বড়ই উপাদেয়। সুতরাং সকলেরই ইহাতে বিশেষ আগ্রহ হয়। পরন্তু তাঁহাদিগের জপ সিদ্ধি যে সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না কেন? তাহা প্রক্রিয়ার দোষ নহে,—দোষ দুরভিসন্ধিপূর্ণ অনুষ্ঠানের। অর্থাৎ তাঁহাদের আসক্তিশূন্য হইয়া সংযত মনে করজপ কি মানসিক জপ সাধনা না করাই এই ফল বিপর্য্যয়ের প্রধান কারণ; সেই জন্য মহাদেব ভগবতীকে বলিয়াছিলেন:—

"জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্ব্বরাননে॥"

ইহার ভাবার্থ :—জপ সাধনার সমবায় কারণ জিহ্বা, কর ও মন। জিহ্বা মন্ত্রোচ্চারণ জন্য, কর জপসংখ্যা স্থিরীকরণ জন্য এবং মন একাগ্রতার জন্য। কিন্তু এই তিনটী যদি পর্য্যায়ক্রমে পরান্নে, প্রতিগ্রহে ও পরস্ত্রী কর্ত্তৃক দগ্ধ বা দূষিত হয়, তবে জাপকের জপ সিদ্ধি কোথায় এবং কি প্রকারে বা সম্ভবপর হয়? সুতরাং জাপকের উচিত উক্ত তিনটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সাধনা করা। লোভ ছাড় তবে সিদ্ধি লাভ হইবে। "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু" এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত নহে কি?

উক্ত ক্রিয়ার জপ সাধন করা কেবল বীর সাধকগণেরই জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে, পশু ও দিব্য সাধকগণের উহা বিহিত নহে। কেন না পশুগণ শুচি পূর্ব্বক বাহ্যিক কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা ক্রিয়া করিবেন এবং দিব্যগণ শুচি হউন বা না হউন সর্ব্বকালই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সাধনা করিবেন। ইহাই তন্ত্রের আদেশ।

"অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ॥"

পশুগণের পূজাদি দিবসেই হইবে, বীরগণের পূজাদি মহানিশায় হইবে এবং দিব্যগণের পূজাদির রাত্রি কিম্বা দিবা কোন নির্দ্দিষ্ট কাল নাই, ইচ্ছা হইলে সর্ব্ব সময়েই তাঁহারা আভ্যন্তরিক ধ্যান ও মানসিক জপ পূজাদি করিতে পারিবেন। তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিধি নিষেধ নাই। তাই তন্ত্র বলিয়াছেন ;—

"দিবা ন পূজয়েৎ দেবীং রাত্রৌনৈব চ নৈব চ।
সর্ব্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবারাত্রৌ ন পূজয়েৎ॥"

এই শ্লোকের প্রথম চরণ বীরের পক্ষে, দ্বিতীয় চরণ পশুর পক্ষে এবং তৃতীয় চরণ দিব্যের পক্ষে। শেষ চরণে 'দিবা রাত্রৌ' অর্থে প্রাতঃ ও সায়াহ্ন—সন্ধ্যাকাল, ঐ উভয় সময় সকল ভাবের সাধকদিগের সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা আছে সুতরাং পূজার কাল নহে। ইহার অন্য অর্থ সমীচীন নহে, কারণ সেগুলি নিতান্ত অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডা মাত্র বা 'জড়ব জড়াং'। বিশেষতঃ স্থানান্তরে স্পষ্টই দেখা যায়;—

"ন দিবা পূজয়েদ্বীরো ন পশোর্রাত্রি পূজনম্।
বিপর্য্যয়ঃ কুলেশানি অভিচারায় কল্পতে॥"

এইরূপে আমরা পঞ্চ 'ম'কার তত্ত্বের অনেক কথা ও রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছি; ইহা ব্যতীত আর যে সমস্ত কথা ও প্রক্রিয়া আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে আলোচনা করা নিতান্ত রুচিবিরুদ্ধ এবং সভ্যতায় বহির্ভূত বলিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে কোন সার বস্তু পাওয়া যায় না তাহা নহে; সেই সমস্ত অশ্লীলতার মধ্যেও অতি সুন্দর জ্ঞানপ্রদ ও সারগর্ভ রহস্য পাওয়া যায়, তবে সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা ও ব্যাখ্যা করা মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে নিতান্তই অবাঞ্ছনীয় ও অসম্ভব। প্রকৃত কর্ম্মী জ্ঞানী ও সাধক গুরু তাহা শিষ্যকে নির্জ্জনে বুঝাইতে পারেন।

উপসংহারে আমাদিগের বক্তব্য এই যে,—যদিও তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ 'ম'কার সম্বন্ধে বাহ্যিক ও মানসিক উভয় বিধ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত আছে, তথাপি তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের সাধকদিগের জন্য পৃথক ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা যে পন্থানুসারী তাঁহারা সেই পন্থারই পৃষ্ঠপোষকতায় নিজ নিজ 'ওকালতি' বুদ্ধিতে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ

সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থন করেন। উভয় পক্ষেরই প্রমাণ যথেষ্ট আছে বটে,—কিন্তু 'অজিয়তি' বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যখন তন্ত্রের সকল সাধনারই সাধারণ নিয়মে বাহ্যিক অপেক্ষা মানসিকেরই উৎকর্ষতা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং অনেক দ্ব্যর্থবাচক শ্লোকেরও আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যায়, তখন সেইরূপ নিয়ম ও অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং সাধকগণ নিকৃষ্ট বাহ্যিক সাধনা দূরে পরিহার করিয়া মানসিক উৎকৃষ্ট সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সুফলভোগী হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেহেতু ধর্ম্মের যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডই ভক্তিমূলক, ভক্তিই ইহার প্রধান উপাদান। ইহাতে কূটতর্ক, বাগ্বিতণ্ডা, বাদীনিরস্ততা প্রভৃতির কিছুই আবশ্যক নাই; চাই কেবল অচলা ভক্তি। তাই পরম প্রেমিক মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন ;—

'ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"